21 AUG 2008

সরকারি পলিটেকনিক শিক্ষা কেমন চলছে

এম আর খায়রুল উমাম

কয়েকদিন আগে পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কুশল বিনিময়ের পর তার সন্তানের কথা জানতে চাইলে বলেন, অনেক আশা নিয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি করেছিলাম। নতুন বিষয় হিসেবে চাকরির বাজার বিবেচনায় আগ্রহ নিয়েই টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়। ২ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা একজনও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক পায়নি। জোড়াতালি দিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। বাবা হিসেবে ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাহীন দেশে এমন অব্যবস্থাকে ব্যতিক্রম বলা যাবে না। সরকার মধ্যম স্তরের দক্ষ জনশক্তি তৈরির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা কি এই জোড়াতালির শিক্ষক দিয়ে সম্ভব হবে। যুগের চাহিদা বিবেচনায় সরকার নতুন নতুন অনেক বিষয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাড়াচ্ছে। কিন্তু শিক্ষক অভাবে তা মাঠে মারা যেতে বসেছে। আমাদের পুরো শিক্ষাভিত্তিক ব্যবস্থাই সমস্যাসঙ্কুল পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেখানে পলিটেকনিক শিক্ষা কোর্সকে আলাদা করার কোন পথ নেই। অগ্রসরমাণ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নতুন নতুন বিষয় খোলা জরুরি। কিন্তু এই কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী না করার কারণে লক্ষ্য,ও উদ্দেশ্য অর্জনে সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পলিটেকনিক শিক্ষার বিকল্প নেই। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই শিক্ষা কোর্স না চালানো হলে মানবসম্পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বাংলাদেশে কাউকেই জবাবদিহি করতে হয় না। একটা সময়ের দাবির মুখে নতুন বিষয় খুলে ২ বছরের মধ্যে শিক্ষক দিতে না পারার ব্যর্থতায় সরকারসহ সংশ্লিষ্টদের কোন জবাবদিহি করতে হয় না। এমন মজার দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ও পরিচালনায় জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে জনগণকে তাক লাগিয়ে দেয়া হয়। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে, দেশী-বিদেশী অর্থে কোটি কোটি টাকার সাজসরঞ্জাম আসছে, সেগুলো দেখার লোক নেই। ভাবতেও মজা লাগে। আমরা চিন্তা-চেতনায় কত দৈন্য হয়ে পড়েছি যে, শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছি শিক্ষক ছাড়া। এ অবস্থার মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা চেয়ে জোড়াতালির শিক্ষকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নতুন অনেক কায়দা-কানুন শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে কাজের কাজ করা থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষকরা এখন পড়ানোর চেয়ে নথিপত্র তৈরিতে বেশি ব্যস্ত। এভাবে মানসম্মত শিক্ষা হতে পারে না। শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক না হলে শিক্ষা কোর্স চলতে পারে না। সরকার যে উপায়েই হোক শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেবে এটাই কাম্য। প্রথমে শিক্ষক নিয়োগ তারপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মানসম্মত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা গেলে তারপরই মানসম্মত শিক্ষা আশা করা যেতে পারে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে দুই জন একজন বা শিক্ষকবিহীন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যেখানে শিক্ষকই নেই সেখানে মানসম্মত শিক্ষা আশা করি কীভাবে? কর্তৃপক্ষের দাবি বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে পরিকল্পনার কি প্রচণ্ড ব্যর্থতা ফুটে ওঠে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। দেশের কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে একটা নতুন বিষয় খোলার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেছে; কিন্তু শিক্ষকের কোন ব্যবস্থা না করেই তা ভাবতে কষ্ট হয়। এখন যদি কোন অভিভাবক প্রশ্ন করেন তার সন্তানকে সরকার এমন শিক্ষা কোর্সে ভর্তি করলেন কেন? যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে নতুন বিষয় খোলা জরুরি বিবেচনা করেছে সরকার তাই বাধ্য হয়ে খুলেছে বা বিদেশে আছে দেখে খুলেছে। বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন বিষয় কেমন হতে পারে? এগুলো মনগড়াহের কোন বিষয় নয়। পুরনো কোন বিষয়কে আরও পিন পয়েন্ট করার লক্ষ্যে নতুন করে সাজানো। যদি এমন হয় এবং অবশ্যই তাই, তাহলে শিক্ষক না পাওয়ার কোন কারণ নেই। যে নতুন বিষয়টি খোলা হচ্ছে প্রথম সেই শিক্ষাগত যোগ্যতার লোক বাংলাদেশে হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজলেও পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কর্তৃপক্ষের দাবি বোধ করি এখানেই যে শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। যদি পুরনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে নতুন বিষয় পড়ানো সম্ভব না হয় তবে বিদেশ থেকে হলেও শিক্ষকের ব্যবস্থা করা জরুরি। সরকার বহু কারণে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসে। শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনে ৪/৫ বছরের জন্য বিদেশ থেকে শিক্ষকদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে এনেও শিক্ষার্থীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা অধিদপ্তরের যদি আমাদের মতো সাধারণ চিন্তার মানুষ থাকেন তবে আপাতত শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্থানে সংশ্লিষ্ট পুরনো বিষয়গুলোর যোগ করা হলেই অচিরে দেশেই শিক্ষক পাওয়া সম্ভব। এই শিক্ষকদের সামান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সঙ্কট উত্তরণের পথ পাওয়া যাবে। তাই কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতায় শিক্ষক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে বসে কর্তৃপক্ষ শিক্ষায়তন প্রধানদের ধমকের ওপর রেখে জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে বাধ্য করছে। এভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে তা দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

পলিটেকনিক শিক্ষা কোর্সের মান উন্নয়নের পথে আরেকটা অন্তরায় বইপুস্তকের অভাব। এই অভাবকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় নোট বইয়ের ব্যবসার রমরমা ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটগুলো পরিণত হয়েছে। বইগুলোর মান নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক প্রশ্ন। সাপ্তাহিক ২০০০ সাময়িকীতে (সংখ্যা-২০, বর্ষ ১০, প্রকাশ ১১-৪-২০০৮) এই নিয়ে একজন শিক্ষার্থীর অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষা কোর্সের পাঠ্যবইয়ের স্বল্পতাকে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দেশের কারিগরি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কিছু বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর্থিক অনুদান, পাওয়ায় বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়। এই সুযোগটা কিছু সুবিধাবাদী মানুষ নোটবই প্রকাশের লাইসেন্স হিসেবে গ্রহণ করে ব্যবসায় রূপান্তর করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভীতি এই নোট বইয়ের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বর্তমান সময়ে এসব নোট বই পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষায়তনের পাঠাগারগুলো মানসম্মত দেশী-বিদেশী বইয়ের অভাবে ধুলা পড়ছে আর শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এসব নিম্নমানের নোটবই নিয়ে ছোটাছুটি করছে। মানসম্মত বইপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ ভুলতে বসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বেশকিছু বই নিয়ে পাঠাগারকে দাঁড় করিয়ে রেখে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা চাওয়া বাতুলতা মাত্র। তাই অবিলম্বে নিম্নমানের নোটবইগুলো সরিয়ে ফেলার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে এবং দেশী বই একান্ত না পাওয়া গেলে বিদেশী বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা জরুরি। প্রয়োজনে বিদেশী বইয়ের অনুবাদ সরবরাহ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিন বছর থেকে চার বছর মেয়াদে রূপান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি চার বছর মেয়াদি ব্যাচ পাস করেছে। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর বাড়ানো হলেও আনুষঙ্গিক কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি, পুরনো শিক্ষক দিয়েই কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের অনেক বিষয় সংযুক্ত হলেও সেসব বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে এখানেও জোড়াতালি বর্তমান। সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল জরুরিভাবে সেখানেও সমন্বয়ের কোন উদ্যোগ নেই। একটা বিভাগে ক্যালকুলাস পড়ানো হয় চতুর্থ পর্বে; কিন্তু তাদের দ্বিতীয় পর্বের পাঠ্যে ক্যালকুলাস আছে। এমন অনেক অসুবিধা নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এর মধ্যে এসে পড়েছে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা। এই ভর্তি ব্যবস্থা পুরো পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিতে বসেছে। মধ্যম মেধার বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য কোর্সটি চালু হলেও আজ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য পলিটেকনিক শিক্ষা সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। জিপিএ বেশি পাওয়া ভকেশনাল এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের মধ্য মেধার শিক্ষার্থীরা এ শিক্ষায় ভর্তি হতে পারছে না। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগবিহীন কোন শিক্ষার্থী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পরপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এতে প্রথম পর্বেই সিস্টেমলস রক্ষা করতে শিক্ষকরা হিমশিম খায়। আর ভকেশনাল থেকে পাস করে আসা শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হবে স্বাভাবিক নিয়মে। এদের জন্য সরকারি কোটাও আছে। সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা না থাকায় গ্রেড পরিবর্তনের কারণে আগের শিক্ষা তার জন্য পলিটেকনিক শিক্ষায় কোন উপকার বয়ে আনতে পারছে না। ভকেশনাল শিক্ষার্থীদের ভর্তির কোটা থাকা উচিত তবে, তা ট্রেডভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন ভকেশনাল থেকে যে শিক্ষার্থী ইলেকট্রিক্যাল পাস করেছে তাকে পলিটেকনিকে ইলেকট্রিক্যালে ভর্তি করতে হবে। কোন্ অবস্থায় গ্রেড নম্বরের জোরে সিভিল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি করা যাবে না। একজন শিক্ষার্থীর আগের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতো আরও ভাল করার সুযোগ করে দেয়া সম্ভব। সার্বিক বিবেচনায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পলিটেকনিক শিক্ষার উন্নয়নে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। মানসম্মত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী পেতে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা কালের দাবি।

বাংলাদেশে সব সমস্যা সেই ব্যবস্থার নিয়ামকদের নিয়ে। পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এর বাইরে নয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমস্যা নিয়ে পলিটেনিক শিক্ষা কোর্স চলছে। মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সহকারী সচিব, মহাপরিচালক, পরিচালক, সহকারী পরিচালক কোনখানেই কর্মকর্তার অভাব নেই। প্রশাসনে গণপদোন্নতির পর ২/৪ জনকে পদস্থ করতে শিক্ষা বিভাগে ছোট আমলা হতে হয়। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। সারাদেশে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সঙ্কট বিরাজমান। রাজধানীর বাইরে একটা শিক্ষায়তন পাওয়া যাবে না যেখানে শিক্ষক সঙ্কট নেই। শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিতে বেশি ব্যস্ত থাকায় একদিকে কঠোর মনোযোগ দিতে পারে না বলে মনে হয়। আমাদের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষক সঙ্কট মানসম্মত শিক্ষায় বাধা হলেও মুষ্টিমেয় শিক্ষকের শ্রম সঙ্কট উত্তরণে কঠোর ভূমিকা রেখে চলেছে বলে এখনও সাধারণ শিক্ষা ভেঙে পড়েনি। মান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও চলছে। কিন্তু পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ না করা হলে মানসম্মত কারিগরি জনশক্তি পাওয়া দুরাশা মাত্র। এখানকার শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজের শিক্ষা নিতে হয়। আন্তর্জাতিক মানসম্মত কারিগরি জনশক্তি পেতে শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি জরুরিভাবে পূরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাসের কাঁচা মালামাল, নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি, যুগোপযোগী বই-পুস্তক, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ভাতা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সরকারকে নজর দিতে হবে। তা হলেই সরকার মানসম্মত মাধ্যম স্তরের কারিগরি জনশক্তি পেতে পারে।

বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে বিশাল অংকের অর্থ বিদেশ থেকে পেয়ে থাকে। দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি করা হয়ে থাকে মূলত অদক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর জনশক্তি। এই জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা গেলে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি সম্ভব। ৯০ দশকের এ হিসেবে বলা যায় যে জনশক্তি রপ্তানি যতগুণ বাড়ে অর্থ প্রাপ্তি তার অর্ধেক গুণ বাড়ে। এটা শুধু অদক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করার কারণে ঘটে থাকে। বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির পাচ্ছে তাই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি না করা গেলে দেশকে পিছিয়ে পড়তে হবে। সরকার প্রতিটা জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩৮টা জেলায় তা স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় দেড় দুইশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন শিক্ষা পর্যক্রম চলায় দেশের সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। অভিভাবকরা খুশি হয়ে সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করছে। পুরা প্রক্রিয়াটি দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক মুক্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু সরকারি কিছু কর্মচারীর অব্যবস্থার কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে সমস্যা সৃষ্টি হলে তা কারও জন্য সুখকর হবে না। আজ সরকারের বিরূপ ব্যবস্থাপনার কারণে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো ভাল নেই। দেশ ও জাতির উন্নয়ন বিবেচনায় নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নতুন নতুন বিষয়ে সংযোজন আসার কথা। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ও জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পড়াশোনা করতে আসে। কিন্তু এখানে এসে শিক্ষার্থীরা বিপদে পড়ে যাচ্ছে যা কাম্য হতে পারে না।

উনিশ শতকের বাঙালি মনীষীদের শিক্ষা চিন্তার যে ব্যাপ্তি, গভীরতা লক্ষ্য করা যায় তা এখনকার চিন্ত ভাবনার থেকে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়। সেই সব মনীষীর মহৎ চিন্তাগুলো বাস্তবে রূপ দেয়া দূরে থাক তা সাধারণ মানুষের সামনে আনাও হয় না। শিক্ষার উন্নতি আর অবনতির মূল কারণ জানেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। আমাদের দেশে শিক্ষার ভালমন্দ দেখার অধিকার নেই এই দুই দলের। যারা শেখান এবং যারা শেখেন তাদের এক পাশে সরিয়ে রেখে যারা শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজ করে থাকেন তারা এ অঙ্গনে ভাড়াটে। ভাড়াটে কোন লোক দিয়ে কোন ব্যবস্থারই উন্নতি হতে পারে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ কামনা করি। সেই শিক্ষা নীতিকে সামনে নিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরিকল্পিত মানবসম্পদ উন্নয়নের ফলে দেশে এক বিচিত্র শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। আমাদের কোন হিসাব নেই দেশের উন্নয়নে কতজন ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, প্রশাসক ইত্যাদি প্রয়োজন। এতে করে নার্সের গিণ ডাক্তার হওয়ায় স্বাস্থ্য সেবা পথ হারিয়ে বসে আছে। রাজনীতির প্রয়োজনে স্কুল-কলেজ হয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি হয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় হয় না, শিক্ষার মান উন্নয়ন হয় না। পরিকল্পনা করে জরুরি কাজটা জরুরিভাবে করা প্রয়োজন। তা না হলে দিনে দিনে শিক্ষা পথ হারিয়ে বসবে। তাতে বিশ্ব থেকে আমরা অনেক অনেক পিছিয়ে পড়ব। ছোট দেশটার বিশাল জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা গেলেই অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব সরকারকে দেয়া প্রয়োজন।